إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ
وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ
بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ
مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

سُورَةُ طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن
يَخْشَىٰ ﴿٣﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾
الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ
فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿٩﴾ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ
لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ
أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا
رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

(৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াযও শুনতে পান?

সূরা ত্বোয়া-হা
মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৩৫

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ন করিনি। (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (৬) নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। (৮) আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই। (৯) আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি। (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন আওয়াজ আসল হে মূসা, (১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ।

জন্যে গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বল্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সামমাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্‌মাক আরয করলেন ঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হবে।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا যারা বাদশাহ্ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে ঃ তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণতঃ উট, ঘোড়া প্রভৃতি। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদের সৎকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। (রুহুল-মা'আনী, কুরতুবী)

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনায় ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্র নামের তসবীহ্ পাঠ করে, যেমন—কোরআন বলে ঃ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্র প্রশংসা-কীর্তন করে না, এমন কোন বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষতঃ আল্লাহ্র জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্তু শেরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।— (রূহুল-মা'আনী)

وَعَدَّهُمْ عَدًّا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ্র কাছে গণনাকৃত। এতে কম-বেশী হতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا অর্থাৎ, ঈমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রার

রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন ঃ কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

(রূহুল-মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।— (কুরতুবী)

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যে দোয়া করে বলেছিলেন ঃ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ হে আল্লাহ্ আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দুরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا বোধগম্য নয় — এমন ক্ষীণতম শব্দকে ركز বলা হয়; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁক-জমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ্ তাআলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

সূরা ত্বোয়া-হা

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম। কারণ, এতে হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ (আঃ)-এর ঘটনার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদের দারেমীতে হযরত আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন আল্লাহ্ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা তোয়াহা ও সূরা ইয়াসীন, ফেরেশতাদেরকে শোনান, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন ঃ ঐ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; তারা পুণ্যবান, যারা এগুলো হেফয্ করবে এবং তারা অপরিসীম সৌভাগ্যশীল, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশে আগমনকারী ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

طٰهٰ — এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ يارجل (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে ওমর থেকে ياحبيبى (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, طه ও يس রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন ঃ কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الم এর ন্যায় বেশ কিছুসংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো متشابهات অর্থাৎ, গোপনভেদ যার মর্ম আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। طه শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ - لِتَشْقَىٰ শব্দটি شقاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কোরআন অবতরণের সূচনাভাবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত এবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোন রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবুল করুক— তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে ঃ আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্যে আমি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়।— (কুরতুবী—সংক্ষেপিত)

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ইবনে কাসীর বলেন ঃ কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোন কোন কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়—সাক্ষাত বিপদ নাযিল হয়েছে; রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর; হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তার কল্যাণকারীতা কত গভীর। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা নির্বোধ। হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে-কাসীর অপর একটি সহীহ্ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্যে খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন ঃ আমি আমার এলম ও হেকমত তোমাদের বুকে এ জন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গোনাহ্ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি না।'

কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত এলমের লক্ষণ অর্থাৎ, আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِّمَن يَخْشَىٰ শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়।

اِسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ - استواء على العرش (আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের উক্তি হচ্ছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা مُتَشَابِهَاتٌ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ্র শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثرى বলা হয় যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثرى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা, নুতন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে, কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ।

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سر পক্ষান্তরে اخفى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে। আল্লাহ্ তাআলা এসব বিষয় সম্পর্কেও সম্যক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সাঃ)-এর জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ, আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্যে বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুওয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লেখিত মূসা (আঃ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে ঃ একদা তিনি মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমত করবেন। তফসীর বাহ্রে-মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শোআয়ব (আঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্যে খোঁজ করছিল। এ আশঙ্কার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশঙ্কা অবশিষ্ট ছিল না। শোআয়ব (আঃ) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ, নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি পরিচিত পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোন সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি মরু অঞ্চলে পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল। মূসা (আঃ) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চকমকি পাথর ব্যবহার করা হত। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত। মূসা (আঃ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবতঃ আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর সঙ্গীও ছিল, কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।— (বাহ্রে-মুহীত)

فَلَمَّا أَتَاهَا — অর্থাৎ, যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন ; মুসনাদে-আহ্মদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বর্ণনা করেন যে, মূসা (আঃ) আগুনের কাছে পৌঁছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। মূসা (আঃ) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হল না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলাবাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হল। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়বী আওয়াজ হল।– (রূহুল–মা'আনী)

মূসা (আঃ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তুয়া'।

نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ – বাহ্‌রে–মুহীত, রূহুল – মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আঃ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জেযার মতই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়— আল্লাহ্ তাআলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা। হযরত মূসা (আঃ) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ্ তাআলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ্ তাআলারই আওয়াজ। এ ছাড়া মূসা (আঃ) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়– হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বোঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ্ তাআলারই।

মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন ঃ রূহুল–মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, মূসা (আঃ)–কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বায়েক' (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হল ঃ আমি তোমার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মূসা (আঃ) আরয করলেন ঃ আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশতার কথা শুনছি? জওয়াব হল ঃ আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল–মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ এ থেকে জানা যায় যে, মূসা (আঃ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল–জমাআতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মূসা (আঃ) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনেননি এবং শুধু কানেই শোনেননি; বরং সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলাবাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্ভ্রমের স্থলে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদবঃ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মূসা (আঃ)–এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাঁদের মতে মূসা (আঃ)–এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক – এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন ঃ বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন ঃ اذا كنت فى مثل هذا المكان فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ, তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফেকাহ্‌বিদের মতে জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রমাণিতও রয়েছে, কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামায পড়া হত। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী।—(কুরতুবী)

اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়তুল্লাহ্, মসজিদে–আকসা ও মসজিদে–নববী। তুয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।—(কুরতুবী)

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ
أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا
مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿١٧﴾
قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا
مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ
تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾
وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً
أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
طَغَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ
عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ
أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾
كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا
بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا
عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾

(১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক। (১৪) আমিই আল্লাহ্ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। (১৫) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। (১৭) হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? (১৮) তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (১৯) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২১) আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শনরূপে; কোন দোষ ছাড়াই। (২৩) এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (২৪) ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে। (২৫) মূসা বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। (৩০) আমার ভাই হারুনকে। (৩১) তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। (৩২) এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। (৩৩) যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। (৩৪) এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন শ্রবণের আদব ঃ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ — ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদব সহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন।— (কুরতুবী)

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي – এই কালামে হযরত মূসা (আঃ)-কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে; অর্থাৎ তওহিদ, রেসালত ও পরকাল। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ বলে রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে فَاعْبُدْنِي এর অর্থ শুধু আমার এবাদত কর — আমা ব্যতীত কারও এবাদত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ — বলে পরকালের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِي — এই নির্দেশে নামাযের কথাও রয়েছে, কিন্তু নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামায সমস্ত এবাদতের সেরা এবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামায বর্জন কাফেরদের আলামত।

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي –উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণ। নামায আদ্যোপান্ত যিকরই যিকর—মুখে, অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে যিকর। তাই নামাযে যিকর তথা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِي শব্দের এক অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাযের কথা ভুলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাযের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে হবে।

أَكَادُ أُخْفِيهَا — অর্থাৎ, কেয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই; এমনকি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও أكاد বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কেয়ামত আসবে— একথাও প্রকাশ করতাম না।

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ –(যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেয়া যায়।) এই বাক্যটি آتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কেয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎকর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়— একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি أَكَادُ أُخْفِيهَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কেয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং

ব্যক্তিগত কেয়ামত অর্থাৎ, মৃত্যুও বিশ্বজনীন কেয়ামত অর্থাৎ, হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। (রূহুল-মা'আনী)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا –এতে হযরত মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তুমি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিয়ো না। তা'হলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, নবী ও পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসত্ত্বেও মূসা (আঃ)-কে এরূপ বলা আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বোঝবে যে, আল্লাহ্‌র পয়গম্বরগণকেও যখন এমনভাবে তাকিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ — তোমার হাতে ওটা কি ? – আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মূসা (আঃ)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানীর সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও খোদায়ী কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জেযা প্রদর্শন করা হল। নতুবা মূসা (আঃ)-এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَالَ هِيَ عَصَايَ মূসা (আঃ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূসা (আঃ) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আরয করেছেন। (এক) উহা আমার লাঠি। (দুই) আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমতঃ এর উপর ভর দেই; দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং (তিন) এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে এশ্‌ক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। এশ্‌ক ও মহব্বতের দাবী এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশতঃ মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবী এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসংকোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ — অর্থাৎ, আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি।— (রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেয়া জায়েয।

মাসআলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে।— (কুরতুবী)

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ –হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠি আল্লাহ্‌র নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে كَأَنَّهَا جَانٌّ — আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ –অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। সাপটির অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, এটি যেখানে যে রূপ আকৃতি ধারণের প্রয়োজন হতো তাই ধারণ করতে সক্ষম ছিল। কখনো খুব সরু, কখনও বিশাল আকারের অজগর ইত্যাদি। ইমাম কুরতুবীর বর্ণনা অনুযায়ী চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে 'জান্নুন' বলা হতো। লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হতো বলে 'ছুওবানুন' বলা হতো।

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ – جناح আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ, বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاءَ এর এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।–(মাযহারী)

اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ –স্বীয় রসূলকে দু'টি বিরাট মু'জেযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্যে চলে যাও।

হযরত মূসা (আঃ) যখন খোদায়ী কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুওয়ত ও রেসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলারই দারস্থ হলেন। কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে পাঁচটি বিষয়ে দোয়া করলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়তের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (অর্থাৎ,আমার কাজ সহজ করে দিন) এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুওয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তাআলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্যে কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। একারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দোয়া করবে ঃ

اللهم الطف بنافى تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير –

(অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ।)

তৃতীয় দোয়া وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي - (অর্থাৎ, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বোঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আঃ) দুগ্ধ পান করার যমানায় তাঁর জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরআউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাআউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মূসা (আঃ) ফেরাআউনের দাড়ি ধরে তার গালে এক চপেটাঘাত করে বসেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরআউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফেরআউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। স্ত্রী আছিয়া বললেন ঃ রাজাধিরাজ ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল-মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরআউনকে পরীক্ষা করানোর জন্যে আছিয়া একটি পাত্রে জলন্ত অঙ্গার ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে মূসা (আঃ)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জলন্ত অঙ্গারটিকে উজ্জ্বল ও সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্যে হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফেরআউন বোঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশতঃ করেছে। কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না; ছিলেন আল্লাহ্র ভাবী রসূল যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মূসা (আঃ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অগ্নিস্ফূলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং মূসা (আঃ) তথক্ষণাৎ আগুনের স্ফূলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরআউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আঃ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশতঃ। এই ঘটনা থেকেই মূসা (আঃ)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই عقدة বলা হয়েছে এবং এটা দুর করার জন্যেই মূসা (আঃ) দোয়া করেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত তিনটি দোয়া ছিল সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য হাসিল করার জন্যে। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্যে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কারণ রেসালত ও দাওয়াতের জন্যে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আঃ)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং মূসা (আঃ) হযরত হারূনকে রেসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا অর্থাৎ, হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِينُ -অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে না। কোন কোন আলেম এর উত্তরে বলেন ঃ হযরত মূসা (আঃ) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকুতে লোকেরা তার কথা বোঝতে পারে। বলাবাহুল্য, সে পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থী নয়।

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي —অর্থাৎ, আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্যে একজন উযীর করুন। পূর্বোক্ত তিনটি দোয়া ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রেসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্যে উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসা (আঃ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উযীর নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উযীরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উযীর তার বাদশাহ্র বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উযীর বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি তার উপর অর্পিত বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন উযীর চেয়ে নিয়েছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উযীর দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উযীর তাতে তাঁর সাহায্য করেন।—(নাসায়ী)

মূসা (আঃ) তাঁর দোয়ায় প্রথমে অনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, উযীর আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উযীর করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারূন—যাতে রেসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। মূসা (আঃ) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মূসা (আঃ)-কে যখন মিসরে ফেরআউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রেরণ করা হয়, তখন হারূন (আঃ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আদেশ দেয়া হয়। তিনি তাই করেন।—(কুরতুবী)

وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي — হযরত মূসা (আঃ) হারূন (আঃ)-কে নিজের উযীর করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল ; কিন্তু বরকতের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুওয়ত ও রেসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্যে পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রেসালতের অংশীদার করে দিন।

সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিকর ও এবাদতেও সাহায্যকারী হয় ঃ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا -অর্থাৎ, হযরত হারূনকে উযীর ও নবুওয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশী পরিমাণে আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে

যে, তসবীহ্ ও যিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তসবীহ্ ও যিকরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহ্ভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহ্ভক্ত নয়, সে ততটুকু এবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহ্ভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকতে চায়, তার উপযুক্ত পরিবেশও তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হল পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবূল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ — অর্থাৎ, হে মূসা, তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হল।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ -হযরত মূসা (আঃ)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুওয়ত ও রেসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জেযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নেয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবত প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে أُخْرَىٰ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নেয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং أُخْرَىٰ শব্দটি কোন সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল-মা'আনী)

মূসা (আঃ)-এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ -অর্থাৎ, যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরআউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। বলাবাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী-রসূল নয়--এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وحى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়—নবী, রসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ — আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 'ওহী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা রসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন - মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণতঃ ইলহামের আকারে হয়; অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহ্গণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবু হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণতঃ হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুওয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসংস্কারের জন্যে কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্যে আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুওয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা; যারা না মানে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুওয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুওয়ত ও নবুওয়তের ওহী শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন বুযুর্গের উক্তিতে একেই ''ওহী-তশরীয়ী'' ও ''গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে নবুওয়তের দাবীদার কাদিয়ানী তার দাবীর বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরাপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার পুস্তক 'খতমে নবুওয়তে' বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً
مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ
أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ
فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ
يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي
وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ
قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن
يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ
وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي
إِسْرَائِيلَ ۖ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن
كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

(৩৯) যে, তুমি (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; হে মূসা, অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। (৪৫) তারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। (৪৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (৪৭) অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি। (৪৮) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর আযাব পড়বে। (৪৯) সে বলল ঃ তবে হে মূসা, তোমাদের পালনকর্তা কে? (৫০) মূসা বললেন ঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৫১) ফেরাউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মূসা জননীর নাম ঃ রূহুল-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান ' গ্রন্থে তাঁর নাম 'লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী' লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবীয ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো ভিত্তিহীন জনশ্রুতি।

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ —এখানে يم শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যতঃ নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ মূসা (আঃ)-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যতঃ চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বোঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি; বরং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন সৃষ্টবস্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়, বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান রয়েছে। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সর্ব বস্তু আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠে মশগুল রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেস্তা ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধি-বিধান আরোপিত হতে পারে।

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ — অর্থাৎ, এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু ; অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহ্র দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তখন ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর দুশমন ছিল না; বরং তাঁর লালন-পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে মূসা (আঃ)-এর শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক বিবেচনা করে অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্র জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখন মূসা (আঃ)-এর শত্রুই ছিল। সে স্ত্রী আসিয়ার মনরক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই মূসাকে হত্যার আদেশ জারি করেছিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে প্রতিহত হয়ে যায়।- (রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي — এখানে مَحَبَّةً শব্দটি - আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে'ই তোমাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। হযরত ইবনে-আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে।— (মাযহারী)

وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ –صنعت শব্দ দ্বারা এখানে উত্তম লালন-পালন বোঝানো হয়েছে। আরবে صنعت فرسى বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ, আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। عَلٰى عَيْنِىْ বলে على حفظى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ছিল যে, মূসা (আঃ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে।

اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ –মূসা (আঃ)-এর ভগিনী সিন্দুকের পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا – অর্থাৎ আমি বার বার তোমাকে পরীক্ষা করেছি। — (ইবনে আব্বাস) অথবা তোমাকে বার বার পরীক্ষায় ফেলেছি। — (যাহ্হাক)

হযরত মূসার (আঃ) জীবনের এ দীর্ঘ পরীক্ষার কাহিনী পাঠ করতে হলে নাসারী শরীফ তফসীর অধ্যায়ে হাদীসুল ফুতুন পাঠ করা যেতে পারে।

হযরত মূসার (আঃ) পর পর পরীক্ষার কাহিনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ কোরআন পাক মূসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফেরাউনের নিজের চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তাআলার বিস্ময়কর পরিকল্পনা ঃ ফেরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হত, সে বছরই মূসা (আঃ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার ছিল, কিন্তু নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মূসা (আঃ)-কে ভূমিষ্ঠ করালেন। আল্লাহ্ তাআলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে মূসা (আঃ) স্বয়ং এই খোদাদ্রোহী জালেমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফেরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে মূসাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করেন। সারা দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মূসা (আঃ) স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিঁড়ি অতিক্রম করছিলেন।

মূসা জননীর প্রতি অলৌকিক নেয়ামত এবং ফেরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ ঃ মূসা (আঃ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ কবুল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফেরাউনের গৃহে এরপরও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে হত। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মূসা (আঃ)-ও কোন কাফের মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ্ তাআলা একদিকে তাঁর পয়গম্বরকে কাফের মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন; মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফেরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপঢৌকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হল। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মূসা-জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফেরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হল না।

শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের জন্যে একটি সুসংবাদ ঃ একে হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মূসা (আঃ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকে দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। — (ইবনে-কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিস্ত্রী মসজিদ, খানকাহ্, মাদ্রাসা অথবা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণ কাজ সৎকাজে নিয়োজিত হবে এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে — এজন্যে একাজকে সে অন্য কাজের উপর অগ্রাধিকার দেয় তবে সে মূসা - জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাগণের প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্তি ঃ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ –আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাগণকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন-পর, শত্রু-মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরগণের স্তর তো অনেক উর্ধ্বে, অনেক ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মূসা (আঃ)-এর হাতে ফেরাউনী কাফেরের হত্যাকে 'ভুলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা হল ঃ মূসা (আঃ) জনৈক ইসরাঈলী মুসলমানকে ফেরআউনী কাফেরের সাথে লড়াইরত দেখে ফেরাউনকে ঘুষি মারলেন; ফলে সে প্রাণ ত্যাগ করল। মূসা (আঃ) নিজেও এ কাজকে 'শয়তানের কাজ' বলে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরাউনী ব্যক্তি কাফের এবং হরবী ছিল। তার সাথে মূসা (আঃ)-এর কোন শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে যিম্মী কাফেরদের তালিকাভুক্তও করা যেত না, যাদের জান-মাল ও সম্মানের হেফাযত করা মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাফের। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গোনাহ্ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভুল কি কারণে সাব্যস্ত করা হল?

বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি। আমি যখন হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর নির্দেশে ''আহ্কামুল-কোরআন'' গ্রন্থের রচনায় নিয়োজিত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বলছেন ঃ এ কথা ঠিক যে, এই ফেরাউনী কাফেরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোন শান্তি-চুক্তি অথবা যিম্মী হওয়া চুক্তি ছিল না। কিন্তু তখন মূসা (আঃ)-এর রাজত্ব ছিল

না এবং সেই নিহত ব্যক্তিরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফেরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত যুক্তি। ফেরাউনকে হত্যার ফলে এই কার্যগত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে 'ভুলক্রমে হত্যা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়- ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আঃ)-এর নবীসুলভ পবিত্রতার পরিপন্থী নয়।

এ কারণেই মাওলানা থানভী (রহঃ) অবিভক্ত ভারতে কোন মুসলমানের পক্ষে কোন হিন্দুর জান-মালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা, মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্রদায়ই তখন ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল ও পরকালে উপকারী ঃ হযরত মূসা (আঃ) মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মূসা (আঃ) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্যে পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকেই প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হত, আল্লাহ্ তাআলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্বরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পয়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক ঃ এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা ঃ মূসা (আঃ) শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফেরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে শোআয়ব (আঃ) স্বীয় কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহ্র অনেক হেকমত এবং মানবজাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

প্রথমতঃ শোআয়ব (আঃ) আল্লাহ্র নবী ও রসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুষ্কর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একথা বোঝে নিয়েছিলেন যে, সৎসাহসী মূসা (আঃ) এ ধরনের আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেন-দেনের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তার গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাফ ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় ছিল মূসা (আঃ)-কে রেসালত ও নবুওয়ত দ্বারা ভূষিত করা। এর জন্যে যদিও কোনরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোন সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জন করা যায় না ঃ কিন্তু আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরগণকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা, এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। মূসা (আঃ)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাঁকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। শোআয়ব (আঃ)-এর সাথে শ্রম ও মজুরীর এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন সম্পর্কিত অনুশীলনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল।

তৃতীয়তঃ মূসা (আঃ)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণতঃ পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক -ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বার বার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন বাঘের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামত পরিচালনা করার জন্যে যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এতে পয়গম্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাঁদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

জাদুকর ও পয়গম্বরগণের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঃ ফেরাউন সমবেত জাদুকরদের দেশ ও জাতির বিপদাশঙ্কা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে।

এর বিপরীতে আল্লাহ্-প্রেরিত পয়গম্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন ঃ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী বায়তুল-মাল থেকে আলেম, মুফতী ও ওয়ায়েযদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁরা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফেকাহ্বিদগণের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলাবাহুল্য, বিনিময় গ্রহণ করার ফলে তাঁদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ফেরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ ঃ ফেরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যতঃ সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ - (জাদুর কারণে এগুলো ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায়নি; বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে দৃষ্টি-বিভ্রাট ঘটিয়ে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ বলে মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফেরাউনী যাদুকরদের যাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না।

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ কারবারের সীমা পর্যন্ত

নিন্দনীয় নয় ঃ ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এদতসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মূসা (আঃ) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্যে অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরণা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্র সমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে।

সমষ্টিগত শৃংখলা বিধানের জন্যে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা ঃ মূসা (আঃ) এক মাসের জন্যে তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তূর পর্বতে এবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হারূন (আঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সাবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্যে কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত।

অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে বড় ধরনের মন্দকেও সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় ঃ মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হারূন (আঃ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেননি। এতে মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাঈল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

-অর্থাৎ, আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি ; কারন তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন করনি।

মূসা (আঃ)-ও তাঁর এ অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেননি; বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্যে দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সাময়িকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে।

মূসা (আঃ)-এর কাহিনীর উপরোল্লেখিত হেদায়েতসমূহের শেষে মূসা ও হারূন (আঃ)-কে একটি বিশেষ নিদর্শন সহকারে ফেরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই ঃ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ঃ এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্খার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত মূসা (আঃ) কেন ভয় পেলেন? إِنَّنَا نَخَافُ মূসা ও হারূন (আঃ) এখানে আল্লাহ্ তাআলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় أَن يَفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবতঃ আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় ভয় أَن يَطْغَىٰ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবতঃ সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশী অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মূসা (আঃ)-কে নবুওয়ত ও রেসালত দান করা হলে তিনি হারূণ (আঃ)-কে তাঁর সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলে দেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

অর্থাৎ, আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ্ তাআলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জেযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্যে স্বভাবগত ভয় দুর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গম্বরের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মূসা (আঃ) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ
اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾
كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾ مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾ وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ
اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا
بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ
يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ
كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ
يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾
فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾
قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾

(৫২) মূসা বললেন ঃ তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব। (৫৬) আমি ফেরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল ঃ হে মূসা, তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে আগমন করেছ? (৫৮) অতএব আমরাও তোমার মোকাবেলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। (৫৯) মূসা বলল ঃ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে। (৬০) অতঃপর ফেরাউন প্রস্থান করল এবং তার সব কলাকৌশল জমা করল অতঃপর উপস্থিত হল। (৬১) মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ দুর্ভাগ্য তোমাদের; তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্‌ভাবন করে, সে-ই বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল ঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। (৬৫) তারা বলল ঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি।

এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই

فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا ..... فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ

এবং আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষ নবী (সাঃ) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ার ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বার বার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাগিদ অনুযায়ী যে স্বভাবগত ভয় পয়গম্বরদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে।

মূসা (আঃ) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী-ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেয়ারও আহবান জানান ঃ এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানব জাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব-স্ব উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে মূসা (আঃ)–এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। মূসা (আঃ) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ একাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবী করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল–তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মূসা (আঃ)–কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা মূসা (আঃ)–এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে মূসা (আঃ) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গম্বর মূসা (আঃ) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ফেরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা (আঃ) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ্ ও জাহান্নামী, তবে ফেরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করে। একথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও মূসা (আঃ)–এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ

হয়ে যেত। মূসা (আঃ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে "সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙ্গেনি।" তিনি বললেন ঃ তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ - ازواج শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتَّىٰ শব্দটি شتيت এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতা-গুল্ম, ফল-ফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ্ তাআলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ অর্থাৎ, এতে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানের জন্যে। نهى শব্দটি نهية এর বহুবচন। বিবেককে نهية (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ - منها শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ এক আদম (আঃ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে "তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি" বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ)-তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন ঃ সব বীর্য মূলতঃ মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারও কারও মতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যতঃ একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্র জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাযকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন ঃ যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি, আবুবকর ও ওমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন ঃ হাদীসটি গরীব। ইবনে জওযী একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহঃ) বলেন ঃ এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। - (মাযহারী)

مَكَانًا سُوًى ফেরাউন মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের মোকাবেলার জন্যে নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত— যাতে কোন পক্ষকেই বেশী দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। মূসা (আঃ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى অর্থাৎ, এই প্রতিযোগিতা সাজ-সজ্জা দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ঈদ অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ঃ ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হত। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন ঃ এটা শনিবার দিন ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত মূসা (আঃ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকদের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে,তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনী যাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান

করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

فَجَمَعَ كَيْدَهُ ফেরাউন মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় কৌশল হিসাবে যাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে যাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর ছিল বলে বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ' থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমত কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার ছিল একজন অন্ধ ব্যক্তি।— (কুরতুবী)

যাদুকরদের প্রতি মূসা (আঃ)-এর পয়গম্বরসুলভ ভাষণ ঃ মু'জেযা দ্বারা যাদুর মোকাবেলা করার পূর্বে মূসা (আঃ) যাদুকরদের শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই ঃ

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ

অর্থাৎ, তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না অর্থাৎ তাঁর সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরীক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানী শক্তি ও লোক-লস্করের সহায়তায় যারা মোকাবেলা করার জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্যে সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাঁদের অনুসারীগণের সত্যের একটি গোপন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। মূসা (আঃ)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে যাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ, এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন ঃ এদের মোকাবেলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্যে তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ কিন্তু অবশেষে মোকাবেলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। তারা বলল ঃ

إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ

অর্থাৎ, তারা উভয়ে যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর জোর তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ অধিকার করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। مُثْلَىٰ শব্দটি امثل এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে, ফেরাউনকে খোদা ও ক্ষমতাশালী মান্য কর, যে - এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম; এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোন কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও 'কওমের তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রাঃ) থেকে তরিকার এই তফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবেলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব যাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও। فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই যাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করল।

যাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রথমে মূসা (আঃ)-কে বলল ঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা (আঃ) জওয়াবে বললেন ঃ بَلْ أَلْقُوا অর্থাৎ, প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং যাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মূসা (আঃ)-এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমতঃ মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। যাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মূসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেয়া। দ্বিতীয়তঃ যাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে একথা বলেছিল। মূসা (আঃ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়তঃ যাতে মূসা (আঃ) -এর সামনে তাদের যাদুর সব লীলা-খেলা এসে যায় এবং এরপরই তিনি তাঁর মু'জেযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। যাদুকররা মূসার (আঃ) কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যতঃ সাপ হয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগল।

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ
اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا
صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ
سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ
اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۭ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۡ
وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰي مَا
جَاۗءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۭ
اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا
خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾
اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۭ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا
يَحْيٰى ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰۗىِٕكَ
لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

(৬৬) মূসা বললেন ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বলল ঃ আমরা হারূন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (৭১) ফেরাউন বলল ঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে; দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিক্ষণ স্থায়ী। (৭২) যাদুকররা বলল ঃ আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি— যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। (৭৪) নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। (৭৬) বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى এ থেকে জানা যায় যে, ফেরাউনী যাদুকরদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ যাদু এরূপই হয়ে থাকে।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মূসা (আঃ) – এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হল ; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন — প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুওয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى এতে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, যাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে মূসা (আঃ)–এর উপরোক্ত আশঙ্কা দূর করে দেয়া হয়েছে।

وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ মূসা (আঃ)–কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মূসা (আঃ)–এর লাঠি বোঝানো হয়েছে; কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের যাদুর কোন মূল্য নেই। এজন্যে পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা–ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হল। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

যাদুকররা মুসলমান হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল ঃ মূসা (আঃ)–এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন যাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ যাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, একাজ যাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জেযা,যা একান্তভাবে আল্লাহ্র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সেজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল ঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, যাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সেজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ খোদায়ী কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। — (রূহুল–মা'আনী)

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ আল্লাহ্ তাআলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে যাদুকরদেরকে বলতে লাগল ঃ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই যাদুকরদের কোন কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জেযা দেখার পর কারও অনুমতির আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন যাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল ঃ এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই যাদুকরই

তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ।

فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ এখন ফেরাউন যাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবতঃ ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ ব্যবস্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে।

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا

যাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হল না। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মু'জেযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরামা বলেন ঃ যাদুকররা যখন সেজদায় গেল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চস্তর ও নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল ঃ এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না।— (কুরতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ এখন তোমার যা খুশী, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজা দেয়ার ইচ্ছা দাও। إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ যাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, যাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবেলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবেলার জন্যে দর-কষাকষিও ফেরাউনের সাথে করেছিল — অর্থাৎ বিজয় হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে যাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপও হতে পারে যে, যাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জেযার মোকাবেলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবেলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে যাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল।— (রূহুল-মা'আনী)

ফেরাউন পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া মোকাবেলার শুভ ফলাফলের জন্যে সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূন (আঃ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন ঃ আমি মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ-পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল ঃ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তাঁর মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্ তাআলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হল।

ফেরাউনী যাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনঃ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا থেকে وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ এসব বাক্য প্রকৃত সত্য যা খাঁটি ইসলামী বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ যাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস কিংবা ধর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আঃ) - এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ্ তাআলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতম শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বেলায়েতের ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেন ঃ আল্লাহ্র কুদরত লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের যাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ্র ওলী ও শহীদ হয়ে গেল।— (ইবনে-কাসীর)।

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ
لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿٧٧﴾
فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾
وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ
اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ
يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾ وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾ وَمَآ اَعْجَلَكَ
عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِيْ وَ
عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا
قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ
مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ
رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿٨٦﴾

(৭৭) আমি মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। (৭৮) অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি। (৮১) বলেছি ঃ আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। (৮৩) হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন? (৮৪) তিনি বললেন ঃ এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (৮৫) বললেন ঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জেযা ও যাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং মূসা ও হারূন (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী-ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হল। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই মূসা (আঃ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশে বলা হল যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা (আঃ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হল। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে ঃ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ্ তাআলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশে এরূপ করা হয়েছিল। —(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী-ইসরাঈলের কিছু অবস্থা ঃ তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ঃ তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আঃ) রাত্রির সূচনাভাগে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী-ইসরাঈল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্যে বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকার পত্র ধার করে নেয়। বনী-ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও খোদায়ী কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুল সংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হল যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য সাগর দেখে বনী-ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মূসা (আঃ)-কে বললঃ اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আঃ) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরী

হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল ঃ এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ্ তাআলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ বাক্যের সারমর্ম তাই। — (রূহুল-মা'আনী)

وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)- কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী-ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে মূসা (আঃ)-কে তওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী-ইসরাঈল স্বয়ং তাঁর বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও মূসা (আঃ)- এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে।

"মান্না" ও "সালওয়া" ছিল এইসব নেয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্যে দেয়া হত।

যখন মূসা (আঃ)ও বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হল, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাট দেখে বনী-ইসরাঈল বলতে লাগল ঃ তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যেও এমনি ধরণের কোন খোদা বানিয়ে দাও। মূসা (আঃ) তাদের বোকামীসুলভ দাবীর জওয়াবে বললেন ঃ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল। إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ তখন আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেয়া হল। মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাআলার এই ওয়াদাদৃষ্টে মূসা (আঃ)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোযা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারূন (আঃ)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী-ইসরাঈল হারূন (আঃ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মূসা (আঃ) দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তার ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী-ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মূসা (আঃ)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

মূসা (আঃ) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ হে মূসা, তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বরা করা সম্পর্কে মূসা (আঃ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য ঃ মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর) রূহুল-মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এই প্রশ্নের কারণ ছিল মূসা (আঃ)- কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই ত্বরা করার জন্যে হুশিয়ার করা যে, নবুওয়তের পদের তাগিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। "ইনতিসাফ" গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আঃ)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত ; যেমন লূত (আঃ)-এর ঘটনায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। - وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

আল্লাহ্ তাআলার উল্লেখিত প্রশ্নের জওয়াবে মূসা (আঃ) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন ঃ আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি ; কারণ, নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফেৎনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মূসা (আঃ)-এর প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারও কারও মতে সে বনী-ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়র বলেন ঃ এ পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে মিসর পৌঁছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। —(কুরতুবী) কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। সে মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই ঃ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ
الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ اَفَلَا
يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ
رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ
عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا
مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ
تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾ قَالَ
فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ
لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا
مِسَاسَ ۚ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ
ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

(৮৭) তারা বলল ঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপর ফেরআউনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরী করে বের করল একটা গো-বৎস—একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল ঃ এটা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, অতঃপর মূসা ভুলে গেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? (৯০) হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন ঃ হে আমার কওম, তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) তারা বলল ঃ মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে বসে থাকব। (৯২) মূসা বললেন ঃ হে হারূন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল? (৯৩) আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ? (৯৪) তিনি বললেন ঃ হে আমার জননী-তনয়, আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আশঙ্কা করলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণে রাখনি। (৯৫) মূসা বললেন ঃ হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল ঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মূসা বললেন ঃ দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি ঃ 'আমাকে স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্যে একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা সেটি জ্বালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই।

করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল।

ফেরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে শিশুর হেফাযত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হল ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল।

اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا হযরত মূসা (আঃ) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্যে তিনি বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলাবাহুল্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার এই ওয়াদার পর তেমন কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই; এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গযব ডেকে আনছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا – ملك শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি ; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলাবাহুল্য,তাদের এই দাবী সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ

وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ – اَوْزَارًا শব্দটি وزر এর বহুবচন। অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কেয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وزر এবং পাপরাশিকে اَوْزَارًا বলা হয়। زينة শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফেরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে اوزار তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আঃ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে হুশিয়ার

করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে তাদেরকে বলেছিল এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্যে বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্যে কখন হালাল ? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়, কিন্তু যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোন চুক্তিও হয়নি —ফেকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় যাদেরকে 'কাফের হরবী' বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্যে মূলতঃই হালাল। এমতাবস্থায় হারুন (আঃ) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্যে হালাল, কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্যে তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। বরং গনীমতের মাল একত্রিত করে কোন টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেয়া হত এবং আসমানী আগুন (বজ্র ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জেহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনীমতের মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জেহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হত। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রসূল করীম (সাঃ)-এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্যে হালাল করে দেয়াও অন্যতম। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী-ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্যে সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে أَوْزَارًا (পাপরাশি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারুন (আঃ) -এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

فَقَذَفْنَاهَا —অর্থাৎ, আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লেখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারুন (আঃ)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণে সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ –হাদীসে ফুতূনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হারুন (আঃ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হারুন (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ আমিও নিক্ষেপ করব? হারুন (আঃ) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারুন (আঃ)-কে বলল ঃ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—আপনি আমার জন্যে এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব— নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারুন (আঃ)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের নীচে থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ, একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটির দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরী করতে উদ্যত হল। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারুন (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে হোক—অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারুন (আঃ)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী-ইসরাঈলকে অলংকারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরী করে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরোক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোন প্রমাণ নেই।

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ –অর্থাৎ, সামেরী এসব অলঙ্কার দ্বারা একটি গো-বৎস অবয়ব তৈরী করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جسد (অবয়ব) শব্দ দৃষ্টে কোন কোন তফসরীবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল— তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ –অর্থাৎ, আওয়াজরত গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল ঃ এটাই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের অসার ওযর বর্ণিত হল। মূসা (আঃ)-এর ক্রোধ দেখে তারা এই ওযর পেশ করেছিল। এরপর ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا –বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে খোদায়ীর কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জওয়াব দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে খোদা মেনে নেয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি?

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ –এখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, মূসা (আঃ)-এর কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবেলা করলে না কেন? কেননা, আমার

উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারুন (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মূসা (আঃ)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আঃ)-এর মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারুন (আঃ) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা (আঃ)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ, আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারুন (আঃ) এরূপ ওযর বর্ণনা করলেন ঃ আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ, এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে।) কোরআন পাকের অন্যত্র হারুন (আঃ)-এর ওযরের মধ্যে এ কথাও রয়েছে ঃ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা, অন্যদের মোকাবেলায় আমার সঙ্গী-সাথী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ -(অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি।) এখানে জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন মূসা (আঃ)-এর মু'জেযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী-ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেয়ার পর মূসা (আঃ)-কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্যে জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্যে আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না।-(বয়ানুল-কোরআন)

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ -রসূল বলে এখানে আল্লাহ্ প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে ঃ

সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে।-(কামালাইন) তফসীরে রুহুল মা'আনীতে এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজ-কালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে।-(বয়ানুল-কোরআন)

এরপর বনী-ইসরাঈলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্র কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বারব করতে লাগল। হাদীসে-ফুতুনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হারুন (আঃ)-কে বলেছিল ঃ আমি মুঠির ভেতরের বস্তু নিক্ষেপ করব, কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করবেন। হারুন (আঃ) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারুন (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌঁছে সে মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী-ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ —হযরত মূসা (আঃ) সামেরীর জন্যে পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবতঃ এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্যে এবং অন্যান্য বনী-ইসরাঈলীর জন্যে মূসা (আঃ)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তায় খোদায়ী কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না ; যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মূসা (আঃ)-এর বদ-দোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত।-(মা'আলেম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলতঃ لَا مِسَاسَ অর্থাৎ, আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি রহস্য ঃ রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে বাহরে-মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মূসা (আঃ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। -(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذَٰلِكَ
نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا
ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ
فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا
عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن
لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ
صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

(৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত। (৯৯) এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। (১০০) যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কেয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে মন্দ হবে। (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সে দিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। (১০৩) তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। (১০৪) তারা কি বলে তা আমি ভালোভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব, আপনি বলুন ঃ আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহ্র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (১১০) তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। (১১১) সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। (১১২) যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে জুলুম ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না। (১১৩) এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্ভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।

لَنُحَرِّقَنَّهُ –(অর্থাৎ, আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা, স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু—দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমতঃ এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংসে সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘসে কণা করে দেয়া—(দুররে-মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো।-(রূহুল-মা'আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবাস্তব নয়। –(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا –বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذكر বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا –অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে ; যথা— কোরআন তেলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গোনাহ্। কেয়ামতের দিন এই গোনাহ্ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দ কর্ম ও গোনাহ্কে কেয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

يُنفَخُ فِي الصُّورِ –হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ صور (ছুর) কি? তিনি বললেন ঃ শিঙ্গা। এতে ফুৎকার দেয়া হবে। অর্থ এই যে, صور শিঙ্গা এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলাই জানেন।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۚ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ
اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا
عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ
لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾
فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ
فَغَوٰى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا
مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾
قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

(১১৪) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। (১১৮) তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। (১১৯) এবং তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল ঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেল। (১২২) এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপথে আনয়ন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। (১২৪) এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। (১২৫) সে বলবে ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ্ বলবেন ঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছেঃ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে, আপনার নবুওয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুঁশিয়ার করার জন্যে আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা (আঃ)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানব জাতির আদি শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রেসালত ও নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا –এখানে عهدنا শব্দটি امرنا অথবা وصينا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।-(বাহ্রে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম (আঃ)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নেয়ামত তোমাদের জন্যে অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আঃ) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, نسيان ও عزم লক্ষণীয় نسيان শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া, অনবধান হওয়া এবং عزم -এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্যে সংকল্পকে দৃঢ় করা। এ শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, আদম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার প্রভাবশালী পয়গম্বরগণের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, আদম (আঃ) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان অর্থাৎ, আমার উম্মতের ভুলবশতঃ গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

আদম (আঃ)-এর এই ঘটনা প্রথমতঃ নবুওয়ত ও রেসালতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গম্বরগণের কাছ থেকে গোনাহ্ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গোনাহ্ নয়।

কিন্তু আদম (আঃ)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্যে গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্যে এই ভুলকে عصيان (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় عزم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আঃ)-এর মধ্যে عزم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আঃ) খোদায়ী নির্দেশ পালন করার পুরাপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাঁকে বিচ্যুত করে দেয়।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰئِكَةِ -আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতের ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল, কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল ঃ আমি অগ্নিনির্মিত আর সে মৃত্তিকানির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সেজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্যে জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নেয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হল যে, একে (অর্থাৎ, এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাক্বারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন ঃ দেখ, সেজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ, আদম ও হাওয়ার) শত্রু। যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ -অর্থাৎ, শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تشقى শব্দটি شقاوة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ— প্রথমটি পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হল ইহলৌকিক কষ্ট। অর্থাৎ, দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বর দূরের কথা, কোন সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যেও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (রহঃ)-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ هو ان ياكل من كد يديه অর্থাৎ, এখানে شقاوت এর অর্থ হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা। -(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জান্নাতের এমন চারটি নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভবিশেষ এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ-অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নেয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নেয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নেয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فَتَشْقَىٰ শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরাঈল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্যে দিলেন এবং বললেন ঃ যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরী করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও আদম (আঃ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আঃ) রুটি তৈরী করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। আদম (আঃ) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাঈল বললেন ঃ হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব ঃ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-এর সাথে হাওয়াকেও সম্বোধন করে বলেছেন ঃ عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ -শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে فَتَشْقَىٰ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরীক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فتشقيا বলা হত। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবনধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। একারণেই فَتَشْقَىٰ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা আদম (আঃ)-কেই করতে হবে। কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তাঁর দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে ঃ কুরতুবী বলেন ঃ এ আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ—অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরও জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণ-পোষণ শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে ; যেমন— পিতা-মাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারগ হলে তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে এসম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ -জীবনধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না—এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদও পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত

না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে–এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى থেকে فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ –এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন আদম (আঃ)–ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল–ফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গোনাহ্। আল্লাহ্র নবী ও রসূল হয়ে তিনি এই গোনাহ্ কিরূপে করলেন? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট–বড় গোনাহ্ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাক্বারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দ্রষ্টব্য। এ আয়াতে আদম (আঃ) সম্পর্কে প্রথমে عصى ও পরে غوى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আঃ)–এর এই কর্ম গোনাহ্ ছিল না, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ্র নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তাঁর সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করতঃ সতর্ক করা হয়েছে। غوى শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং (দুই) পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এস্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, আদম (আঃ) জান্নাতে যে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকী রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গম্বরগণের সম্পর্কে একটি জরুরী নির্দেশ ঃ তাঁদের সম্মানের হেফাযতঃ কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে عصى ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তাঁর ভাষায় এইঃ

لايجوز لاحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه فـــى اثناء قوله تعالى عنه اوقول نبيه فاما ان يبتدى ذلك من قـبـل نفسه فليس بجائز لنافى ابائنا الادنين الينا المماثلين لنا فكيف فى ابينا الاقوم الاعظم الاكرم النبى المقدم الذى عذره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفرله–

"আজ আমাদের কারও জন্যে আদম (আঃ)–কে অবাধ্য বলা জায়েয নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ্ তাআলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ্ যাঁর তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্যে কোন অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়।"

এ কারণেই কুশায়রী আবু নছর বলেন ঃ কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে আদম (আঃ)–কে গোনাহ্গার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েয নয়। কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুওয়ত–পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। তাই কোরআনী আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েয, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই।–(কুরতুবী)

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا –অর্থাৎ, জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই সম্বোধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ –এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌঁছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরীক করা অবান্তর; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে— তাদের সন্তান–সন্ততির পারস্পরিক শত্রুতা। বলাবাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতা–মাতার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ –এখানে যিকর–এর অর্থ কোরআনও হতে পারে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন— অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَّسُوْلًا বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন অথবা রসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ, কোরআনের তেলাওয়াত ও বিধি–বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তার পরিণাম এই ঃ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى –অর্থাৎ, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কেয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব কেয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ পয়গম্বরগণের প্রতি দুনিয়ার বালা–মুসীবত সবচাইতে বেশী কঠিন হয়। তাঁদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণতঃ কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম–আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এই উক্তি পরকালের জন্যে হতে পারে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের আযাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا –এর তফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বোঝানো হয়েছে।–(মাযহারী)

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۚ وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ
الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾
فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۗ لَا
نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوْا
لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ
الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا
رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ
اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ
فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

(১২৭) এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী। (১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। (১৩০) সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ ও দিবাভাগে, সম্ভবতঃ তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিবজীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিণাম শুভ। (১৩৩) এরা বলে ঃ সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে? (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে।– (মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ – يهد ক্রিয়াপদের فاعل এর ضمير – هدى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هدى দ্বারা কোরআন অথবা রসূল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন অথবা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্‌র আযাবে গ্রেফতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে فاعل এর ضمير আল্লাহ্‌র দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দেননি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ –মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্যে নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (এক) আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। (দুই) আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হয়ে যান। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ –বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল হওয়া ঃ এ জগতে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কোন মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে; যদিও তা মৌখিক গালি-গালাজই হয়। সম্মুখে গালি-গালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। (এক) সবর ; অর্থাৎ, স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। (দুই) আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ও এবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্যে একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন

রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে; তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكَ تَرْضٰى অর্থাৎ, এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন-যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার অথবা এবাদত করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্যে গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র স্মরণ ও এবাদত তাঁরই তওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سبح بحمد -শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণতঃ শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণতঃ "সূর্যোদয়ের পূর্বে" বলে ফজরের নামায, "সূর্যাস্তের পূর্বে" বলে যোহর ও আসরের নামায এবং وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ -বলে রাত্রিকালীন সব নামায— মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর وَاَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মুমিনের জন্যে আশঙ্কার বস্তু ঃ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ -এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তাআলা যে নেয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার রহস্য ঃ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যতঃ এখানে আলাদা আলাদা দু'টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং (দুই) নিজেও নামায অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্যেও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যক। কেননা, পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবতঃ নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই اهل শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যহ ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে গমন করে الصلوٰة الصلوٰة (নামায পড়, নামায পড়) বলতেন।-(কুরতুবী)

ধনকুবের ও রাজরাজড়াদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্যে জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শোনাতেন।-(কুরতুবী)

যে ব্যক্তি নামায ও এবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ্ তার রিযিকের ব্যাপার সহজ করে দেন ঃ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا -অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে এই দাবী করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিযিক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা, রিযিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশীর মধ্যে মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু বীজের ভেতর থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করা এবং তাকে ফল-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে মানুষের কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হেফাযত ও আল্লাহ্ কর্তৃক সৃজিত ফল-ফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন।

بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى -অর্থাৎ, তওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহীফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্যে পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى অর্থাৎ, আজ তো আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু এই দাবী কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ্‌র কাছে কোন্‌টি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল।